তারিখ 19 JUN 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

সাত সতেরো

লক্ষ্যহীন উচ্চশিক্ষা

হারাধন গাঙ্গুলী

শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে ২ শতাংশ। প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। তারপরও বেড়েছে। শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব মহলই প্রতিবছর কথা বলে থাকেন। সবার দাবি বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এটি অবশ্যই জিডিপির ৭ শতাংশের কম হলে চলবে না। কিন্তু প্রকৃত হিসাবটা বোধহয় কেউই একটু তলিয়ে দেখে না। শুধু কি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ বাড়িয়ে দিলেই শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বেড়েছে এটা ভাবা যায়? মোটেই নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাইরেও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম থাকে। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। থাকে গবেষণা কার্যক্রমও। এর সবগুলোকেই হিসেবে নিয়ে তারপরেই বলতে হবে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কত। সেই বিবেচনায় শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ঢের অনেক বেশি যা আমরা হিসাব করি না।

তার পরও মূল ধারা শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণের প্রশ্নটি গুরুত্বহীন নয়। তবে আমরা সব সময়েই বরাদ্দের পাশাপাশি একে গুণগতভাবে কাজে লাগানোকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। শুধু বরাদ্দ বাড়ানোর দাবিই আমাদের কাছে প্রাধান্য পায় না। সেটি কি কাজে লাগলো হলো নাকি বারো ভুতে লুটেপুটে খাচ্ছে, বাস্তবায়নের অদক্ষতায় অপচয় হচ্ছে সেটাকেই আমরা বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চাই। বাস্তবায়নের প্রতিটি স্তরে আমরা এর রিটার্ন ও 'ব্যয়-লাভের' আনুপাতিক হিসাব করতে দেখতে চাই।

কারণ স্বাধীনতার পর থেকেই আজ পর্যন্ত শিক্ষা খাতে যে ধারায় বরাদ্দ হয়েছে তার যদি হিসাব নেয়া হয় এবং তা দিয়ে যদি কষ্ট-বেনিফিট হিসাব করা হয় তাহলে বলা যায় লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা এবং নিচের স্তরে শিক্ষায় বিরাজ করছে অসামঞ্জস্যতা এবং বৈষম্য। এবং এর জন্য অপ্রতুল আর্থিক বরাদ্দ যতটা না দায়ী, তার চেয়ে ঢের বেশি দায়ী বরাদ্দকে কাজে লাগানোর অদক্ষতা এবং দুর্নীতি।

তার প্রমাণ বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা নিয়ে আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (এআইবিএম) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে গত বছর একটি জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে উচ্চশিক্ষার নানা সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্যসহ দুই শতাধিক শিক্ষক আলোচনা করেছেন।

জ্ঞান সৃষ্টি, জ্ঞান বিতরণ ও জ্ঞানের প্রয়োগ এই তিনটি হলো উচ্চশিক্ষার মূল লক্ষ্য। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনও বিতর্কিত ও পক্ষপাতদুষ্ট। যোগ্যতা ও মেধা এখানে বিবেচ্য নয়। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপনায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ প্রকট। উপাচার্যদের দেয়া হয়েছে অবাধ ক্ষমতা, যা তারা প্রয়োগ করেন ক্ষমতাসীনদের , সমর্থনে। সর্বোপরি সুশাসনের অভাব রয়েছে পাবলিক প্রাইভেট প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই।

উচ্চশিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। তৈরি হচ্ছে না গ্রহণযোগ্য নতুন ধারণা। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানে উন্নীত হতে পারছে না দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই। তারা ঢুকতে পারছে না বিশ্বের প্রথম সারির ১০০ এমন কি ২০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায়ও। যদিও সরকারি-বেসরকারি মিলে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন প্রায় ১০০ এর কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে।

উল্লেখিত সেই সম্মেলনের মতামতের ভিত্তিতে সম্প্রতি 'উচ্চশিক্ষার কৌশলগত ব্যবস্থাপনা ও কার্যকর নেতৃত্ব' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এআইবিএস। উপরের কথাগুলো তারই আলোকে বলা হলো।

মানসম্পন্ন শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা শিক্ষকের। কিন্তু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগ মানসম্পন্ন শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

এআইবিএসের প্রতিবেদন বলছে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে হচ্ছে না। রাজনৈতিক বিবেচনাই এখানে মুখ্য। মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি)। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তহবিলের ৯০ শতাংশের বেশি আসে ইউজিসি থেকে। যদিও এ তহবিলও পর্যাপ্ত নয়। এ তহবিলের বণ্টনও সঠিকভাবে হয় না। এর ওপর রয়েছে আর্থিক নানা অনিয়ম। এসব পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এআইবিএস বলছে। আর্থিক বিষয় ছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর ইউজিসির কার্যত কোন নিয়ন্ত্রণই নেই।

এ প্রসঙ্গে ইউজিসির চেয়ারম্যানের মন্তব্য হলো দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও অনিয়ম রয়েছে। এসব সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা। ইউজিসির বর্তমান কাঠামো দিয়ে তা সম্ভব নয়। তাই ইউজিসিকে উচ্চশিক্ষা কমিশনে রূপান্তরের চেষ্টা করা দরকার। এটি সম্পন্ন হলে শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সব নিয়োগই স্বচ্ছতার ভিত্তিতে করা যাবে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় সরকার ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপকে বড় ধরনের সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটি স্বাভাবিক বিষয় তা স্বীকার করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অপ্রয়োজনীয় ও অযাচিত হস্তক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা।

শিক্ষকদের মধ্যে সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার প্রবণতাও উচ্চশিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশের জন্য বাধা হিসেবে দেখা হয়েছে প্রতিবেদনে। কারণে শিক্ষকদের এ প্রবণতা কখনো কখনো শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনা পরিবেশকে জটিল করে তোলে।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতিকেও ত্রুটিপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের ও মূল্যায়নের যে পদ্ধতি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনুসরণ করে তা ত্রুটিপূর্ণ। তাছাড়া দেশের অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এখনও গড়ে ওঠেনি। যার মাধ্যমে শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা যাচাই করা সম্ভব হয়।

জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এবং ছাত্র রাজনীতিকে অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখছে এআইবিএস। তারা বলছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাকে এটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় নেই নির্বাচিত ছাত্র সংসদ। বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়েই অনুপস্থিত শক্তিশালী ও কার্যকর অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। পাশাপাশি ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে লৈঙ্গিক সমতার ঘাটতি রয়েছে।

অবকাঠামোর ঘাটতির কথা বলা হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববদ্যালয়ের ক্ষেত্রে। বেসরকারিভাবে গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেশিরভাগেরই নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাস নেই। যেগুলোর আছে, তারাও ন্যূনতম মানদণ্ড পূরণ করতে পারছে না। এ সব বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার বিষয় বলা হয়েছে, বোড অব ট্রাস্টির হাতেই এখানকার সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। যদিও উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষের দিকে মনোযোগ নেই অধিকাংশের। তাদের প্রভাবে বিদ্যাপীঠের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিণত হচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। তাছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো লাভজনক নাকি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান সেটিও স্পষ্ট নয়। এখানে মানসম্মত শিক্ষার অনিশ্চয়তা আছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, এর কারণ একাধিক। শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক বিবেচনা যেমন আছে। তেমনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যায়ে আছে প্রতিষ্ঠাতার চাপ। ফলে কেউ ভালো পড়াতে পারছেন না। আবার ভালো শিক্ষক নিয়োগ দিলেই যে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা যাবে তা নয়। শিক্ষক মনোযোগের সঙ্গে প্রস্তুতি নিয়ে বরাদ্দ সময়টির পূর্ণ ব্যবহার করছে কি-না তা তদারকির কোন ব্যবস্থা নেই।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন কাঠামোর বৈষম্য রয়েছে। গবেষণার ঘাটতিও ভালো শিক্ষক না পাওয়ার অন্যতম কারণ। সার্বিকভাবে বলা যায় আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় মানের দৈন্য আছে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান এ সব সংকট উত্তরণে বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি গবেষণা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়েছে। গবেষণালব্ধ জ্ঞানের নিয়মিত প্রকাশনা, মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের বেতন ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে এআইবিএস। সবশেষে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ইউজিসিকে আরও শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে এআইসিএসের মূল ফোকাসটা কিন্তু অর্থ বরাদ্দের উপর নয়। উচ্চশিক্ষার যে সংকটের চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো সেখানে অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ সৃষ্ট সংকটের পরিধি খুবই সামান্য। দেখা গেছে সুশাসনের ঘাটতিই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হিসেবে দেখা দিচ্ছে। এই সুশাসনের ঘাটতি যদি বিরাজ করে তা হলে আমরা মনে করি, অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে দিলেও অবস্থার উন্নতি হবে না। লুটপাটের সুযোগই বাড়বে বরং।

আমরা এআইবিএসের প্রতিবেনের বিষয়টি একটি লক্ষ্য নিয়েই তুলে ধরেছি। যার মোদ্দাকথা হলো সব কিছুতেই বরাদ্দ অপ্রতুল এ কথা না বলে প্রাপ্ত বরাদ্দকে কিভাবে দক্ষতার সঙ্গে এবং দুর্নীতিমুক্ত পথে ব্যবহার করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়, সে চেষ্টাই করতে হবে সংশ্লিষ্টদের।

উচ্চশিক্ষা যদি বিশ্ববিদ্যালয়েক আত্মস্থ করতে না পারে, শিক্ষার ফল যদি গবেষণালব্ধ না হয়, তাহলে উচ্চশিক্ষার সৃজনশীলতাই মুখ থুবড়ে পড়বে। আমরা তো সে লক্ষণই এখন দেখতে পাচ্ছি সর্বত্র।

বরাদ্দ বাড়ানো দরকার। তবে উচ্চশিক্ষার সৃজনশীল বিকাশ একমাত্র বরাদ্দের ওপর নির্ভর করে না। এআইবিএসের প্রতিবেদন তার প্রমাণই বহন করছে।

লেখক সহকারী সম্পাদক,
gharadhan@gmail.com